OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 302
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 294 - 302
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

আধুনিক ইকোসেন্ট্রিসম্ ধারণার নিরিখে প্রাচীন তপোবনের কল্পনা এবং নির্বাচিত দুটি রবীন্দ্র গীতিনাট্য : একটি মূল্যায়ন

ড. সম্‌হিতা ভট্টাচার্য
অধ্যাপিকা, পারফর্মিং আর্টস্ বিভাগ
সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : samhitaofficial84@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Tapovana, Environmental thoughts, Forest, nature, Rabindranath Tagore.

Abstract
Through this research article two selected Geetinatya (musical dramas) of Rabindranath Tagore i.e. Kalmrigaya and Balmiki Pratibha have been discussed with reference to Tagore's imagination and illustration of forest-scenario especially the ancient concept of 'Tapovana' of India (i.e. the forest for meditation, austerities etc.) which have been intermingled with his thought about nature and modern environmental concept.

Today, we know that, the excessive growth of Industrialization and urbanization is one of the major causes of depletion of forest cover from our mother earth. Therefore, according to the concept of 'Ecocentrism' of modern environmental philosophy imposing the recognition of intrinsic value on nature and thought of conservation of forest are very much important and all these ideas are very much akin to our oriental spiritual thoughts and concept of Tapovana. Particularly, in our Indian Sanskrit literature and drama the representation of 'Tapovana' was very much common and 'Tapovana' was considered to be the place of good harmonious interaction between human and nature and moreover nature was being worshipped there as God. On the other hand, the term Anthropocentrism (western view) is totally found to be reverse and against nature and environment. Therefore, the myth of 'Tapovana' is not irrelevant in the context of today's modern environmental thoughts. So, the main objective of this research article is to enquire as to how Rabindranath Tagore as a successor of such tradition, attempted to unify those Indian traditional values with today's modern environmental thoughts related to human-nature relationship and how he tried to channelize this idea through his excellent and unique literary thoughts and imagination of forest on his two well-known Geetinatya Kalmrigaya and Balmiki Pratibha.

Discussion

ভূমিকা : বর্তমান বিশ্বে 'পরিবেশ' অত্যন্ত চর্চিত একটি বিষয়। আর এর সাথেই চলে আসে আরেকটি শব্দ – পরিবেশ চেতনা। মানব সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে ও সর্বোপরি আমাদের এই পৃথিবী নামক গোলকটিকে ও তার প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষার তাগিদে এই চেতনাটি আজ সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে। তবে এর মূলে আছে প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্কের রসায়নটি। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় ও মননে প্রকৃতি-মানব সম্পর্কটি বরাবরই গুরুত্ব পেয়েছে। তাই আধুনিক বিশ্বের পরিবেশ চেতনায় কিভাবে যেন এসে মিলেছে শাশ্বত ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ তপোবনের কল্পনা। কিন্তু কিভাবে? এই প্রবন্ধে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আর এই সকল চিন্তার বৃত্তে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবেশ ঘটেছে খুব সহজাতভাবে। তাঁর ঔপনিষদিক চিন্তায় লালিত গভীর প্রকৃতিবোধের মননশীল দিকটি অরণ্য ও তপোবনের কল্পনার মধ্য দিয়ে কিভাবে যেন প্রকাশিত করেছে আজকের আধুনিক পরিবেশ দর্শনকে। রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টিভাণ্ডারের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে দুটি রত্নকে; তাঁর দুটি গীতিনাট্য – 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'। উক্ত বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের এই গীতিনাট্য দুটির সাংগীতিক প্রয়োগ, কাহিনী, দৃশ্যায়ন প্রভৃতির মধ্যে কিভাবে এবং কতটা সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তার সন্ধান ও মূল্যায়নের প্রয়াস করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে মূল আলোচনার ক্ষেত্র সেটিই।

ইকোসেন্ট্রিসম্ ও প্রাচীন তপোবনের কল্পনার একাত্মতা :

এখন প্রশ্ন হল ইকোসেন্ট্রিসম্ কী? এবং তপোবনের তাৎপর্যই বা কোথায়? এতক্ষণে একটা বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, পরিবেশ চেতনা কিংবা পরিবেশ সম্পর্কিত দর্শনের পশ্চাতে রয়েছে প্রকৃতির সাথে মানবের সম্পর্কের বিষয়টি। প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্কটি ঠিক কেমন হওয়া উচিত অথবা প্রকৃতির প্রতি মানুষের ব্যবহার বা দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে দুটি বিপরীতমুখী মতবাদ প্রচলিত। এর একটি হল – 'Anthropocentrism' বা মানব-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে বলা হচ্ছে –

> "Anthropocentrism is the belief that considers human beings to be the most significant entity of the universe and interprets or regards the world in terms of human values and experiences;"[১]

অর্থাৎ মানুষই সমগ্র পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু এবং তাকে কেন্দ্র করেই সবকিছু আবর্তিত এবং সেই কারণে মানুষের প্রকৃতিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে - যা পাশ্চাত্য দর্শন প্রভাবিত বলে অনেকে করেন। অন্য মতটি হল – 'Ecocentrism' বা পরিবেশ-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা এখানে বিশেষ আলোচ্য। তার সংজ্ঞাটি হল –

> "Ecocentrism is a term used in ecological political philosophy to denote a nature-centered, as opposed to human-centered (i.e. Anthropocentric) system of values."[২]

অর্থাৎ এটি হল পরিবেশ-কেন্দ্রিক দর্শন যা মনুষ্য-কেন্দ্রিক দর্শনের বিপরীত; যেখানে বলা হয় যে মানুষের কখনই প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করার অধিকার নেই, বরং সে প্রকৃতির এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। যার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকারও মানুষের ওপর বর্তায় না। আবার অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রকৃতি ও মানব সম্পর্কের দর্শনে একটি মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করে Responsible stewardship[৩] বা দায়িত্ব-সচেতন নায়েবীর কথা বলেছেন, অর্থাৎ যেখানে প্রকৃতির তত্ত্বাবধায়ক হবে মানুষ। কিন্তু এখানেও প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্বের ধারণাটি থেকেকেই যায়। বলা বাহুল্য যে, প্রকৃতিকে রক্ষার স্বার্থে দ্বিতীয় মতটি অর্থাৎ Ecocentrism বা পরিবেশ-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই গৃহীত হয়েছে এবং নরওয়ের বিখ্যাত দার্শনিক ও পরিবেশবিদ Arne Næss এই চিন্তায় প্রভাবিত হয়েই সত্তরের দশকে Deep ecology নামক পরিবেশ দর্শনের কথা প্রথম বলেন। Deep ecology–র সংজ্ঞাটি এরকম –

> "Deep Ecology is an environmental philosophy that promotes the inherent worth of all living beings regardless of their instrumental utility to human needs, and the restructuring of modern human societies in accordance with such ideas."[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 302
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থাৎ মানুষ-সহ পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিটি জীবের স্বকীয় মুল্য ও সমান গুরুত্বকে স্বীকার করার মধ্য দিয়েই সম্ভব আধুনিক মানব সমাজের সফল পুনর্গঠন। আর এই চিন্তার পশ্চাতে Arne Næss এক আধ্যাত্মিক চিন্তার অনুপ্রেরণাকে দায়ী করেছেন, যার বীজ লুকিয়ে আছে আমদের প্রাচ্য চিন্তায়, আমদের ভারতবর্ষীয় ঔপনিষদীয় ঐতিহ্যে। শাশ্বত ভারতের তপোবনের কল্পনাও সেই ভাবনারই দোসর। ব্যাকরণগতভাবে 'তপোবন' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় – তপঃ+বন=তপোবন। 'তপঃ' অর্থে তপস্যা এবং 'বন' অর্থে অরণ্য। অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে সাধনা বা তপস্যার সঙ্গে যে অরণ্য বা বনের যোগ রয়েছে তা'ই হল তপোবন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তপোবন' প্রবন্ধে লিখেছেন –

> "কিন্তু ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে...।"[৫]

তার প্রতিধ্বনিতেই বলা যায় যে, এই তপোবনই ছিল একসময় ভারতের ঐতিহ্য; সাধনা ও জ্ঞানের আবাসস্থল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের 'তপোবন' কবিতায় ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ তপোবনের যে বর্ণনাটি দিয়েছেন, সেটি এরূপ -

> "মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন
> পুরব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ
> মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়া লয়ে ...
> মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ
> বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন।"[৬]

আসলে এই তপোবনে বসেই হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের বৈদিক ভারতবর্ষের আর্য ঋষিরা তাঁদের উৎকৃষ্ট জ্ঞান বা সাধনার দ্বারা প্রকৃতিকে একদিন যেভাবে দেখেছিলেন ও উপলব্ধি করেছিলেন, সেই উপলব্ধি বা বোধ তাঁদের কখনো প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শেখায় নি। প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে প্রকৃতির সাথে সম্মিলিত হয়ে থাকাটাই তাঁদের শিক্ষা, সাধনা ও জীবনচর্যার অঙ্গ ছিল এবং বৈদিক সংস্কৃতিতে প্রকৃতিকে দেব জ্ঞানে বন্দনার রীতিও আমাদের অজানা নয়। আমাদের সুপ্রাচীন গ্রন্থ বেদ, উপনিষদ প্রভৃতির মন্ত্রগানে (ঋগবেদের দশম মণ্ডলের নদীমন্ত্র, সুক্ত-৭৫ অরণ্যানী স্তুতি, সূক্ত- ১৪৬ প্রভৃতি) তার প্রমাণ মেলে। আমদের প্রাচীন সাহিত্য গুলিতে বিশেষত সংস্কৃত সাহিত্যে যে অরণ্যের চিত্র পাওয়া যায়, তা প্রকৃত অর্থেই 'তপোবন'। ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে এমন একটি তপোবনের কথা রয়েছে যেখানে প্রকৃতির পশু-প্রাণী বৃক্ষরাজির সাথে মানুষের এক অপূর্ব সম্মিলনের চিত্র প্রস্তুত হয়; যেখানে প্রকৃতিকে রক্ষা করার বার্তা প্রচারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ এমন একটি দৃশ্যের কথা বলা যায় যেখানে কন্বমুনির আশ্রমের আশ্রমিকরা রাজা দুষ্মন্তকে তপোবনের কৃষ্ণসার মৃগকে মারতে নিষেধ করছেন –

> "ভো ভো রাজন্! আশ্রমমৃগোহয়ং ন হন্তব্যো, ন হন্তব্যঃ।"[৭]

খুঁজলে এমন উদাহরণ আরও মিলবে। এ প্রসঙ্গে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি খুব উল্লেখযোগ্য –

> "এই জন্যেই আমাদের দেশের কবিত্বে যে প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় অন্য দেশের কাব্যের সঙ্গে তার যেন একটা বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব করা নয়, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন।"[৮]

আবার 'তপোবন' প্রবন্ধের আরেক জায়গায় কবি বলছেন যে, যা কিছু মহৎ, পবিত্র, শ্রেষ্ঠ ও পুজ্য - সে সবকিছুই তপোবনস্মৃতির সাথে জড়িত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কথার রেশ ধরেই বলা যায় যে, 'তপোবন' কল্পনাকে যতই 'মিথ' হিসেবে দেখা হোক না কেন, তার পশ্চাতে প্রকৃতি ও তার উপাদানকে রক্ষা করার যে কল্যাণময় দর্শনটি রয়েছে তা আসলে যে আধুনিক পরিবেশ-কেন্দ্রিক চিন্তার পুষ্টিসাধন করে - এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। এ'ই হয়তো দার্শনিক Arne Næss – এর সেই আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা, যা Deep ecology নামক চিন্তার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু ভেবে বিস্মিত হতে হয় যে, তপোবন-সমৃদ্ধ শাশ্বত ভারতের উত্তরসূরি ও উপনিষদিক শিক্ষায় লালিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু বছর আগেই অরণ্য ও তপোবনের চিত্রণে এনেছেন প্রকৃতিকে রক্ষার কথা এবং সেই সচেতনতা পরিণত বয়সে গিয়ে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ, কবিতা, গান, চিঠিপত্র প্রভৃতি সৃষ্টিকর্মে আরও গভীর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্র বিশ্লেষণে অরণ্য ও তপোবনের চিত্র :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পরিণত বয়সে রচিত প্রবন্ধে এ কথা স্বীকার করেছেন যে, ভারতের প্রকৃতি প্রেম ও প্রকৃতিবোধের বিশিষ্টতার ফলেই আমাদের ভারতীয় অরণ্য 'শান্তরসাস্পদ' তপোবনে পরিণত হয়েছে, যা আফ্রিকা বা আমেরিকার অরণ্য থেকে পৃথক। কারণ ঐ সব অরণ্যে মানুষ হয় অরণ্য-প্রকৃতিকে ভয় পেয়েছে নয় তো তার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছে। কবির মতে –

> "তপোবন আফ্রিকার বন যদি হত তা হলে বলতে পারতুম প্রকৃতির সঙ্গে মিলে থাকা একটা তামসিকতা মাত্র। কিন্তু মানুষের চিত্ত যেখানে সাধনার দ্বারা জাগ্রত আছে সেখানকার মিলন কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়ত্বজনিত হতে পারে না। সংস্কারের বাধা ক্ষয় হয়ে গেলে যে মিলন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তপোবনের মিলন হচ্ছে তাই।"[৯]

রবীন্দ্রনাথের মতে এই সম্মিলনই হল প্রকৃত অর্থে প্রকৃতির সঙ্গে মানব-চিত্তের সম্মিলন, 'নিখিলের সঙ্গে যোগ', 'ভুমার সঙ্গে মিলন'- যা ভারতের আরণ্যক ঋষিরা পেয়েছিলেন তাঁদের সাধনাকৃত উপলব্ধির দ্বারা। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কাব্য, নাটক ইত্যাদির মধ্যে অরণ্য চিত্রণে চিন্তাগত ফারাক লক্ষ করেছেন। কবি লিখছেন –

> "শেক্সপিয়রের As You like It নাটক একটি বনবাসকাহিনী – টেম্পেস্টও তাই, Midsummer Night's Dreamও অরণ্যের কাব্য। কিন্তু সে-সকল কাব্যে মানুষের প্রভুত্ব ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবারে একান্ত– অরণ্যের সঙ্গে সৌহার্দ্য দেখতে পাই নে। অরণ্যবাসের সঙ্গে মানুষের চিত্তের সামঞ্জস্যসাধন ঘটেনি।"[১০]

অন্যদিকে –

> "রামায়ণে রামের বনবাস হল। কেবল রাক্ষসের উপদ্রব ছাড়া সে বনবাসে তাঁদের আর কোনো দুঃখই ছিল না। তাঁরা বনের পর বন, নদীর পর নদী, পর্বতের পর পর্বত পার হয়ে গেছেন... এই সমস্ত নদীগিরি অরণ্যের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের মিলন ছিল।"[১১]

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যেও তার প্রভাব পড়তে বাধ্য।

গীতিনাট্য বাল্মীকিপ্রতিভা এবং কালমৃগয়া :

আমরা জানি যে, গীতিনাট্য বাল্মীকি প্রতিভা ও কাল মৃগয়া রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের রচনা। যৌবনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জ্যোতি দাদার (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর) আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক রচনার প্রারম্ভিক সময় ছিল সেটি। 'জীবনস্মৃতি'-তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে –

> "বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর-কিছু রচনা করি নাই।"[১২]

সদ্য বিলেত ফেরত রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মিলন সাধন ও প্রয়োগের সাংগীতিক উত্তেজনা তো প্রকাশিত হয়েছিলই এই দুটি গীতিনাট্যে; তার সাথে এ'ও লক্ষণীয় যে, এই দুটি গীতিনাট্যের বিভিন্ন দৃশ্যে অরণ্য-প্রকৃতিকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং অরণ্য ও ঋতুর অনুষঙ্গ গীতিনাট্য দুটির দৃশ্যনির্মাণে, চরিত্র চিত্রণে ও গান রচনায় প্রভাব ফেলেছে। বিশেষত বনদেবী ও বনদেবতা নামক চরিত্রের রূপায়ণ, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সৃষ্টি। দুটি গীতিনাট্যেই অরণ্যের যে কোনও রকমের বিপন্নতায় রবীন্দ্রনাথ তপোবনের শান্তিরক্ষা ও সর্বোপরি অরণ্য রক্ষার দায়িত্ব যেন অর্পণ করেছেন এই বনদেবতা ও বনদেবী-গণের হাতেই। এবার বিশদ আলোচনায় যাওয়া যাক।

বাল্মীকিপ্রতিভা :

গীতিনাট্যটি রচিত হয়েছিল ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে। বাল্মীকিপ্রতিভার বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' কাব্য থেকে। বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দস্যু রত্নাকরের ঋষি বাল্মীকিতে রূপান্তর

ও প্রথম কাব্যের সৃষ্টি – এ'ই হল বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের মূল বিষয়বস্তু। বাল্মীকিপ্রতিভার দৃশ্য আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, সেখানে অরণ্যের অনুষঙ্গটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

- প্রথম দৃশ্যটিই একটি অরণ্যের দৃশ্য। কিন্তু দস্যু নেতা রত্নাকর ও তাঁর দস্যুদল যখন লুঠ-পাট করে উল্লাস করতে করতে সেই অরণ্যে প্রবেশ করে তখন শান্ত অরণ্যের শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় ও অরণ্যের পশুপাখি ও বৃক্ষদলের প্রাণনাশের চিন্তায় বনদেবীরা আকুল হয়ে ওঠে। তাঁরা গেয়ে ওঠে –

“সহে না, সহে না, কাঁদে পরান।
সাধের অরণ্য হল শ্মশান...
আকুল কানন, কাঁদে সমীরণ,
চকিত মৃগ, পাখি গাহে না গান।”[১৩]

অরণ্য রক্ষার দায় নিয়ে অরণ্যের এই অতন্দ্র প্রহরী বনদেবীরা গীতিনাট্যের প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকে।

এরপর দেখা যায় শ্যামাভক্ত দস্যু দলপতি রত্নাকরের আদেশে দস্যুদল এক বালিকাকে শ্যামা মায়ের উদ্দেশ্যে নরবলি দেওয়ার জন্য ধরে নিয়ে যেতে থাকে। তখনও বনদেবীদের আবির্ভাব ঘটে। ছোট্ট বালিকাটির জন্য তাঁদের প্রাণ কেঁদে ওঠে।

“মরি ও কাহার বাছা। অকে কোথায় নিয়ে যায়
আহা, ঐ করুণ চখে ও কাহার পানে চায়...
এ বনে কে আছে, যাব কার কাছে –
কে ওরে বাঁচায়”[১৪]

- দ্বিতীয় দৃশ্যে বালিকাকে নিয়ে দস্যুরা যখন তাদের দলপতির সামনে এসে হাজির হয় বলির উদ্দেশ্যে তখনও সেখানে নেপথ্য থেকে বনদেবীরা কাতর ভাবে প্রার্থনা করে –

  “দয়া করো অনাথারে দয়া করো গো”...[১৫]

  আর ওদিকে ছোট্ট বালিকাকে দেখে দস্যু রত্নাকরের মনও যেন পরিবর্তিত হতে থাকে। সে বালিকাকে মুক্ত করে দিতে বলে।
- তৃতীয় দৃশ্যে দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হতে থাকে। আর তাতেও সাক্ষী থাকে অরণ্য।
- চতুর্থ দৃশ্যে বর্ষা-প্রকৃতির সমারোহে মুখর হয়ে ওঠে অরণ্য। এখানেও বনদেবীদের আগমন ঘটে। এখানে এঁরা যেন প্রকৃতির দূতী হয়ে বর্ষাঋতুর উৎযাপনের আনন্দ ছড়িয়ে দেয় বনে বনে –

  “রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে বরষে
  গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা,
  ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে”...[১৬]

  কিন্তু তখনও বাল্মীকির মন ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত। সে আবার দলবল নিয়ে ছোটে শিকারে। আর এবারও একইভাবে বনদেবীরা আবির্ভূত হন অরণ্যের শান্তি রক্ষায়, অরণ্যের জীবকে রক্ষা করতে।

  “কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে
  সাধের কাননে শান্তি নাশিতে...
  কী জানি কি হবে আজি এ নিশীথে,
  তরাসে প্রাণ কাঁপে উঠিয়া”[১৭]

আর এখানেও বনদেবীদের আবির্ভাবের পরেই দস্যু থেকে বাল্মীকিতে রূপান্তরের আরেকটি ধাপ সম্পন্ন হতে দেখা যায়। বাল্মীকির তীর-ধনুক ফেলে শিকার থেকে বিরত হওয়ার প্রতিজ্ঞা সে কথাই প্রকাশ করে –

“রাখ্ রাখ্, ফেল ধনু, ছাড়িস নে বান।।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 302
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হরিণশাবক দুটি প্রাণভয়ে ধায় ছুটি,
চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণনয়ান...
আজ হতে বিসর্জিনু এ ছার ধনুক বান"[১৮]

- এরপর পঞ্চম ও ষষ্ঠ দৃশ্যে দস্যু থেকে কবি বাল্মীকিতে রূপান্তরের কাহিনী কিভাবে পরিণতি লাভ করেছে তা আমাদের অজানা নয়।

কিন্তু এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, অরণ্য এখানে কেবল কাহিনীর পটভূমিতে বিরাজ করেছে এমন নয়, মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে এবং হিংস্র মনোবৃত্তি থেকে দয়া-ক্ষমা-করুণা প্রভৃতি মনুষ্য গুণসম্পন্ন মনোবৃত্তিতে উত্তরণের সহায়ক হয়েছে, যার পশ্চাতেও রয়েছে রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রকৃতিবোধ। তাই বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম সংস্করণে বনদেবীরা না থাকলেও এর দ্বিতীয় সংস্করণে (প্রচলিত সংস্করণ) বনদেবীদের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণভাবে গীতিনাট্যে আরোপিত করেছেন কবি। বনদেবীদের বারংবার বন বা অরণ্য রক্ষার প্রচেষ্টা কি আজকের অরণ্য সংরক্ষণের চিন্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? যতবারই বাল্মীকি অরণ্যে শিকার ও জীবহত্যার মতো হিংস্র বৃত্তিতে উদ্যত হয়েছেন, ততবারই বিবেকের মতো আবির্ভূত হয়ে বনদেবীরা পরোক্ষভাবে যেন তাঁকে সেই কার্য থেকে বিরত করেছেন। তবে এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, রবীন্দ্রচিত্তে ভারতবর্ষীয় যে শান্ত ও শাশ্বত তপোবনের চিত্রটি ছিল তার সাথে বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্যে দস্যুদল আক্রান্ত অরণ্যের মিল কি তেমন আছে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এই গীতিনাট্যে দস্যুদলের শিকারের দৃশ্যটি যেমন বিদ্যমান, তেমনই অরণ্যের শান্তিরক্ষার ও প্রাণীহত্যা থেকে বিরত করার বার্তাটিও রয়েছে। আসলে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই অরণ্যই সাক্ষী থেকেছে দস্যু থেকে ঋষি বাল্মীকিতে রূপান্তরের মতো বৈপ্লবিক ও ইতিবাচক ঘটনার। ক্রৌঞ্চমিথুন বধের দৃশ্য দেখে আকুল হয়ে ব্যাধকে অভিশাপ দিয়েছিলেন আদিকবি। জন্ম হয়েছিল প্রথম কাব্যের। তখন বনভূমি না হোক মনভূমি তো তপোবনেই রূপান্তরিত হয়েছিল। এমন ইতিবাচক ঘটনার সাক্ষী যে অরণ্য তাকে 'তপোবন' বলতে দ্বিধা হয় না। রবীন্দ্রনাথের কথার রেশ ধরেই বলা যায়, এমন ঘটনা ভারতবর্ষীয় অরণ্যেই হয় তো সম্ভব। তপোবনের ইতিবাচক এই সত্ত্বাটি কোনও না কোনোভাবে প্রকাশ পেয়েছেই এই গীতিনাট্যে – এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

কালমৃগয়া :

বাল্মীকিপ্রতিভার এক বছর পর অর্থাৎ ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে কালমৃগয়া রচিত। কালমৃগয়ার কাহিনীটি রামায়ণ থেকে গৃহীত। এর বিষয়বস্তুটি হল রাজা দশরথ-কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্র নিধন। এখানে রবীন্দ্রনাথ অপূর্বভাবে তপোবনের নানা দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। বলা বাহুল্য কালমৃগয়াতেই প্রথম কবি বনদেবী ও তার সাথে বনদেবতার চরিত্রের অন্তর্ভুক্তি করেছেন। বাল্মীকি প্রতিভার সাথে তুলনা করলে এই গীতিনাট্যে বহিরঙ্গে অরণ্যের চিত্রটি প্রাচীন ভারতবর্ষের শান্তরসাস্পদ তপোবনের কল্পনার সাথে হুবহু মিলে যায়। কিন্তু এখানেও বাল্মীকি প্রতিভার মতো অরণ্যের দুটি দিকই প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রবেশ করা যাক দৃশ্যগুলির আলোচনায়।

- এর প্রথম দৃশ্যেই রয়েছে এক শান্তরসাস্পদ তপোবনের চিত্র, যেখানে জীবহত্যা নিষিদ্ধ। সেখানে অন্ধমুনির সাথেই বাস করে তাঁর দুই পুত্র-কন্যা ঋষিকুমার ও লীলা, যারা প্রকৃতিরই সন্তান যেন। প্রকৃতির মধ্যেই তাদের বেড়ে ওঠা, প্রকৃতির মধ্যেই তাদের আনন্দপূর্ণ বিচরণ। প্রকৃতির সাথে তারা নিবিড়ভাবে একাত্ম। প্রকৃতির মধ্যেই তাদের খেলা, গান। প্রকৃতির সাহচর্যেই তাদের নিত্যদিনের আনন্দ। বকুল গাছে 'রাশি রাশি হাসির মতো' ফুল ফোঁটা দেখে লীলা ডাকে তাঁর ঋষিকুমার ভাইকে – "ও দেখবি রে ভাই আয় রে ছুটে মোদের বকুল গাছে।" তবে সন্তর্পণে আসতে বলে যাতে গাছের তলায় পড়ে থাকা ফুলগুলি রক্ষা পায় –

"কত গাছের তলায় ছড়াছড়ি
গড়াগড়ি যায় -
ও ভাই, সাবধানেতে আয় রে হেথা,
দিস নে দ'লে পায়।"[১৯]

তপোবনের প্রতিটি ফুল, তরুলতা ও জীবের প্রতি সহমর্মিতা ও তাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে থাকার এই সহবত শিক্ষা ডিপ ইকোলজির মতো পরিবেশ দর্শনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

- দ্বিতীয় দৃশ্যটির সম্পূর্ণ অংশ জুড়েই বনদেবীরা নাচে গানে ব্যাপৃত। এই দৃশ্যের গানগুলিতে প্রকৃতির অপরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য গানগুলি হল – "সমুখেতে বহিছে তটিনী"[২০], "ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে"[২১], "নেহারো, লো সহচরী"[২২] প্রভৃতি।
- তৃতীয় দৃশ্যে রয়েছে তপোবন সংলগ্ন অন্ধমুনির কুটীর, যা সর্বদা বেদগান মুখরিত। রবীন্দ্রনাথ এখানে ছান্দোগ্য উপনিষদের কিছু শ্লোকের প্রয়োগ করেছেন যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
  "অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভুমিবুধ্নো ন জীর্যতি দিশোহস্য স্রক্তয়ো দ্যৌরস্যোত্তরং বিলং স এষ কোশোবসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতম্"।।[২৩]
  এই মন্ত্রে স্বীকার করে নেওয়া হয় এক সজীব সত্ত্বার (কোশ) অস্তিত্ত্ব; আকাশ, ভূমি, বায়ু সহ সমগ্র বিশ্বভুবন এর অঙ্গীভূত। এভাবেই বিশ্বপ্রকৃতির সাথে মানব অস্তিত্বের একাত্মতার বিষয়টি তপোবনের চিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন, যা আজকের পরিবেশ সচেতক চিন্তার দ্যোতক।
- চতুর্থ দৃশ্যেরও বিরাট অংশ জুড়ে বনদেবতা ও বনদেবীদের বর্ষা ঋতুকে বরণ করার এক অপরূপ সমারোহ দেখা যায়। বিশিষ্ট রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ ডঃ অরুণ কুমার বসুর মতে বর্ষার গানে-নাচে এখানে যেন এক জমজমাট বর্ষামঙ্গলের আয়োজন করেছেন রবীন্দ্রনাথ।[২৪] এখানে বেশ কিছু বর্ষার গান রয়েছে। যেমন – "ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে বরষে"[২৫] (বনদেবীদের গান), "সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া"[২৬] (বনদেবতার গান) ইত্যাদি। কিন্তু এই দৃশ্যের শেষের দিকে বর্ষা মুখরিত আঁধার রাতে ঋষিকুমারের পিতার জন্য জল আনার চিত্রে প্রকৃতি যেন এক অমঙ্গলের বার্তা নিয়ে আসে। আঁধার রাত্রি, নীরব অরণ্য আর তার মাঝে মেঘের ঘনঘটা ও বিদ্যুতের ঝলকানি। অরণ্য-প্রকৃতির এই থমথমে পরিবেশ যেন নেতিবাচক কিছুর ইঙ্গিত দেয়, যার আভাস যেন পায় এই প্রকৃতির দূতী বনদেবীরা। তাঁরা যেন তাঁদের সন্তানসম ঋষিকুমারকে মায়ের মতো আগলাতে চায়। তাঁরা ঋষিকুমারকে জল আনতে যেতে নিষেধ করে –

  "এই ঘোর আঁধার, কোথা রে যাস্
  ফিরিয়ে যা, তরাসে প্রাণ কাঁপে"[২৭]

  কিংবা

  "মানা না মানিলি, তবুও চলিলি-
  কী জানি কী ঘটে"[২৮]

  এমনকি লতাপাতা-বৃক্ষরাজিও যেন তার পায়ে জড়িয়ে তাকে আটকাতে চায়।
  "জড়ায়ে যায় চরণে লতাপাতা"[২৯]
  এই ভাবে সমগ্র প্রকৃতি যেন তাঁদের সন্তানকে রক্ষা করতে চায়।

- পঞ্চম দৃশ্যে শান্ত অরণ্যের চিত্র একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যায়। শিকারীর দল নিয়ে রাজা দশরথের আগমনে অরণ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। এখানেও বনদেবীদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের আশঙ্কা – "কী জানি কী হবে আজি এ নিশীথে।"[৩০] এই দৃশ্যেই ঘটে সেই অমঙ্গলকর ঘটনা। রাজা দশরথ করীশিশু ভ্রমে ঋষিকুমারকে বধ করেন। রাজা দশরথের অরণ্যে মৃগয়া এবং অন্ধমুনির পুত্রকে বধ প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন প্রকৃতি-মানব সম্পর্কের বিপরীতমুখী ও নেতিবাচক দিকটি কবি তুলে ধরেছেন, তেমনই প্রকারান্তরে অরণ্য ও তপোবনের সংরক্ষণের ও শান্তিরক্ষার ভাবনাটি প্রস্ফুটিত হয়েছে।
- ষষ্ঠ দৃশ্য তথা শেষ দৃশ্য সমাপ্ত হয় ঋষিকুমারের মৃতদেহ নিয়ে বনদেবীদের বিলাপ গানে –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 294 - 302
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"সকলই ফুরালো স্বপনপ্রায়!
কোথা সে লুকালো, কোথা সে হায়।
কুসুমকানন হয়েছে ম্লান,
পাখিরা কেন রে গাহে না গান"[১১]

গানটির ভাষা লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এখানে প্রকৃতির মানস পুত্র ঋষিকুমারের মৃত্যুতে প্রকৃতির মাঝে যেন এক বিষণ্ণতার চিত্র অঙ্কন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ যেন মনে করিয়ে দেয় মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ -এ শকুন্তলার পতিগৃহে যাওয়ার দৃশ্যটি, যেখানে কবির বর্ণনায় তপোবন-প্রকৃতি যেন শকুন্তলাকে যেতে দিতে চায় না; অরণ্যের তরুলতা, হরিণ শিশু তাকে ধরে রাখতে চায়। কারণ শকুন্তলাকে ছাড়া তারা থাকবে কি করে? আর মহাকবি কালিদাসের ভাবশিষ্য ও প্রাচ্য চিন্তার ধারক ও বাহক রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সাথে মানবের সম্মিলনের এমন চিত্রই আঁকতে চেয়েছেন।

উপসংহার : বাল্মীকিপ্রতিভা এবং কালমৃগয়া রবীন্দ্রনাথের নেহাত অল্প বয়সের রচনা বলে এ প্রশ্ন মনে আসা খুব স্বাভাবিক যে তাঁর এই দুটি গীতিনাট্যে গানের সুরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাইরেও এই প্রকৃতি-চেতনা, অরণ্য রক্ষার চিন্তা, তপোবনের কল্পনা ও প্রকৃতি-মানব সম্পর্ক এই বিষয়গুলি যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, তা যুবক রবীন্দ্রনাথ কতটা সচেতনভাবে করেছিলেন। এর উত্তরে বলা যায় যে, বাল্যকাল থেকেই পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে প্রাপ্ত ব্রহ্মচিন্তা, উপনিষদের শিক্ষা এমনভাবে তাঁর শিরা ধমনীতে মিশে গিয়েছিল যে, সেখানে এমন চিন্তাগুলি সেই অল্প বয়সেও খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবেশ করেছে তাঁর রচনায়। তবে আমাদের ভুললে চলবে না যে, এই রবীন্দ্রনাথই পরিণত বয়সে গিয়ে প্রকৃতির সংরক্ষণের কথা জোরের সঙ্গে শুধু বলেনেই নি, শান্তিনিকেতনে তাঁর কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তাকে প্রকাশ করেছেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাঙ্গনে প্রকৃতির মাঝে বসে শিক্ষার ভাবনা যে আসলে ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ তপোবনে প্রকৃতির কোলে বসে অধ্যয়নের ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। কাজেই এ কথা মেনে নিতেই হবে যে, রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য দুটি গীতিনাট্য বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়ায় যে অরণ্যের চিত্র ফুটে উঠেছে, তাতে একদিকে যেমন এসে মিলেছে ভারতীয় তপোবনের ঐতিহ্য, তেমনই আধুনিক পরিবেশ দর্শনের নিরিখেও তা সমান প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

Reference:

১. https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropocentrism
২. https://en.wikipedia.org/wiki/Ecocentrism
৩. চৌধুরী, পরমেশ, পরিবেশ বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ, (এস চৌধুরী, কলকাতা, ১৪০৫), পৃ. ৮২
৪. https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_ecology
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (তপোবন প্রবন্ধ) রবীন্দ্র রচনাবলী (সুলভ সংস্করণ) সপ্তম খণ্ড, (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ), পৃ. ৬৯০
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্ররচনাবলী, (সুলভ সংস্করণ) ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ৬, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা, পৃ. ১৯
৭. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, নির্বাহী সম্পাদক প্রসূন বসু, (নবপত্র প্রকাশন), পৃ. ১৪১
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (তপোবন প্রবন্ধ) রবীন্দ্র রচনাবলী (সুলভ সংস্করণ) সপ্তম খণ্ড, (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ), পৃ. ৬৯৬
৯. প্রাগুক্ত
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৮
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৭

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (জীবন স্মৃতি) রবীন্দ্র রচনাবলী (সুলভ সংস্করণ) নবম খণ্ড, (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ. ৪৮৪

১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান (অখণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট, কলকাতা-১৬, পৃ. ৬৩৫

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৯

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪০

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৪

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৬

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৮

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৭, ৬১৮

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৯

২২. প্রাগুক্ত

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২০

২৪. বসু, অরুণকুমার, বাংলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত,(দে'জ পাবলিশিং, ২০১০), পৃ. ৩৩৮

২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান (অখণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট, কলকাতা-১৬, পৃ. ৬২২

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২১

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৩

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. প্রাগুক্ত

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৯

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৪

Bibliography:

চৌধুরী, পরমেশ, পরিবেশ বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ, এস চৌধুরী, কলকাতা, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্ররচনাবলী সুলভ সংস্করণ তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্ররচনাবলী সুলভ সংস্করণ সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

বসু, অরুণকুমার, নজরুল জীবনী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬

সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, নির্বাহী সম্পাদক প্রসূন বসু, নবপত্র প্রকাশন

ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রঃ-

https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropocentrism

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecocentrism

https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_ecology